প্রথম অধ্যায়

১.১ চলিত গদ্য : ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে

রবীন্দ্র উপন্যাসে চলিত গদ্যরীতির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আগে আমাদের সাধুভাষা ও চলিতভাষা সম্পর্কে ধারণাটি পরিস্কার করা প্রয়োজন। 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থে' (১৮১৫)।[১] সুকুমার সেন সাধুভাষা সম্পর্কে বলেছেন—

> "যাহাকে এখন সাধুভাষা বলা হয় তাহা ঊনবিংশ শতাব্দের সৃষ্টি হইলেও উহার আয়োজন আগের শতাব্দেই সম্ভৃত হইয়াছিল। গদ্যশৈলীকে আশ্রয় করিয়াই এই সাধুভাষার উদ্ভব, পণ্ডিত ও মুনশিদে কলমেই বাঙ্গালা সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম ও বিকাশ। ইঁহারাই ইঁহাদের রচনার ভাষাকে "সাধু গৌড়ীয় ভাষা" সংক্ষেপে 'সাধুভাষা' নাম দিয়াছেন।"[২]

ভাষাতাত্ত্বিক মুরারি মোহন সেন সাধুভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন।—

> "বাঙ্‌লা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ রহিয়াছে। এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীরা বুঝিতে পারিবে না—এইজন্য ভাষাকে সর্ব্বজনবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে সাহিত্যে প্রয়োগের উপযোগী একটি সংস্কৃতানুগ রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মাত্র শতাব্দীকালের মধ্যে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই নাম সাধুভাষা এবং ইহা মুখ্যতঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন কথ্য ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহা হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষার প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে।"[৩]

সাধুভাষার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছেন তিনি—

১. সাধুভাষা সমগ্র বাংলাদেশের সাধারণ সম্পদ—এর কোন আঞ্চলিক রূপ নাই।

২. এতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বেশি।

৩. এর বাক্যরীতি বিশেষভাবে নিয়মনিবদ্ধ।

৪. এতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৫. সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যের জন্য এই ভাষার একটি সহজ গাম্ভীর্য ও পরিপাট্য লক্ষিত হয়। বিষয় গৌরব থাকলেও আভিজাত্য বাড়ে।

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে

> "প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে গদ্যভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া না গেলেও বাঙলা গদ্যের প্রবণতাটুকু অনুভব করা যায়। লক্ষ্য করা যায়—কাব্যে ব্যবহৃত মধ্যযুগের বাঙলা থেকেই আধুনিক সাধুভাষার ক্রমিক উত্তরণ ঘটেছে। এই মধ্য বাঙলা-আশ্রিত সাধু আদর্শের উপর শুধু আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষারই একাধিপত্য ছিল না, ছিল বরেন্দ্রী এবং বঙ্গালীরও প্রভাব। প্রারম্ভিক ঊনিশ শতকে সংস্কৃত আদর্শে বাঙলা সাধুভাষায় পণ্ডিতী রীতি আরোপিত হ'লো। সাধুভাষায়

> দেখা দিল—সংস্কৃতসুলভ সমাসবাহুল্য, ব্যাকরণগত প্রক্ষেপ অথবা জটিল বাক্যপ্রয়োগ এবং তৎসহ তৎসম ও আভিধানিক শব্দবাহুল্য। লক্ষ্য করা যায় যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই চরমপন্থী গদ্যধারার পাশাপাশি সাধু আদর্শের একটা নতুন মানদণ্ডও গড়ে উঠছিল। বাঙলা সাধুভাষার এই বিকাশপর্বে বাঙলা গদ্যরীতিতেও ঘট্‌লো আমূল পরিবর্তন, যুগান্তকারী বিপ্লব। ভাষা-শিল্পী বিদ্যাসাগরের রচনায় এই সাধুভাষা বিশেষ প্রাঞ্জলতা ও শিল্পসম্মত রূপ লাভ করলো।"[৪]

সাধুভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "The Origin and Development of the Bengali Language"-এ বলেছেন "...with its forms belongings to Middle Bengali, and its vocabulary highly Sanskritised."[৫]

রামেশ্বর শ'এর মতে "অধিক সংখ্যক বিশুদ্ধ সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ, মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার শব্দরূপ ক্রিয়ারূপ বিভক্তি অনুসর্গ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠা সাধুভাষা ছিল অনেকটা কৃত্রিম, বিদগ্ধ, ধীর-গম্ভীর ভাষা যার ব্যবহার ছিল শুধুই সাহিত্যে সীমাবদ্ধ।"[৬]

এবার চলিত ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

রামরাম বসু সর্বপ্রথম 'চলন ভাষার' উল্লেখ করেন।[৭] সুকুমার সেন চলিত ভাষা সম্পর্কে বলেছেন "ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্ব অংশের উপভাষার তথা কলিকাতার কথ্যভাষার পদ ও ইডিয়ম মূলধন করিয়া আধুনিক কালের সাহিত্যের এবং ভদ্র ব্যবহারের প্রধান ভাষা-ছাদ চলিত ভাষার উদ্ভবটি ও বিকাশ।"[৮]

মুরারি মোহন সেনের মতে—

> "যে ভাষায় সাধারণ লোক দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্ত্তা বলে তাহাই চলিত ভাষা। অঞ্চলভেদে এই চলিত ভাষার অনেক রূপ—বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপের মধ্যে ধ্বনিগত ও রূপগত কিছু কিছু পার্থক্য আছে। আবার একই আঞ্চলিকরূপে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা উচ্চ-নীচ স্তরভেদে পার্থক্য আছে। ইহাদের মধ্যে ভাগীরথীর উভয় কূলবর্তী অঞ্চলগুলির শিক্ষিত জনগণের মৌখিক ভাষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া আদর্শ চলিতভাষা (Standard colloquial) গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এই ভাষা সাহিত্যিক মর্য্যাদালাভ করিয়াছে।"[৯]

আদর্শচলিতভাষা বা Standared Colloquial-কে নবরূপের সাধুভাষা বলেছেন—"অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী—"এই চলিত ভাষাকে নবরূপের সাধুভাষাই বলা উচিত ; কারণ, ইহা শিক্ষিত, মার্জিতরুচি, সংস্কৃতিসম্পন্ন সাধু বা সজ্জনগণের অনুমোদিত।"[১০]

চলিত ভাষার বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলেছেন—

১. এটি একটি জীবন্ত ভাষা—এতে চলিত শব্দের প্রয়োগ বেশি, সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ অল্প।

২. এতে ক্রিয়াপদ সর্বনামপদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।

৩. চলিতভাষার বাচনভঙ্গী ও বাক্যরীতি আলাদা।

৪. এর উপর বাংলার অন্যান্য অংশের মৌখিক ভাষার প্রভাব পড়েছে।

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য চলিত ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন :—

> "সাধুভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি আনার প্রবণতা থেকে সৃষ্টি হ'লো চলিত ভাষা। এখানে কথাটা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। সাহিত্যে ব্যবহৃত চলিত ভাষা আর মুখের ভাষা কখনও এক হয় না—মুখের ভাষা অঞ্চলভেদে বহু রূপান্তর লাভ করে। তারি কোন একটাকে ভিত্তি ক'রেই রচিত এবং শিক্ষিত মার্জিত সংস্কৃতিসম্পন্ন শিষ্টজনের অনুমোদিত চলিত ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এই শিষ্টজনসম্মত চলিত ভাষা বা Standard Colloquial Language-কে 'প্রমিত ভাষা' বা 'স্বীকৃত কথ্যভাষা'ও বলা হ'য়ে থাকে। যাহোক্ আধুনিক বাঙলা ভাষায় এখন লেখার ভাষাতে দুটি ছাঁদ প্রচলিত আছে—একটি ছাঁদের নাম 'সাধুভাষা' এবং 'দ্বিতীয়টির নাম 'চলিত ভাষা'। মুখের ভাষার সঙ্গে সাধুভাষার ব্যবধান অনেক বেশি, পক্ষান্তরে চলিত ভাষার ব্যবধান স্বল্পতর।"[১১]

তিনি অপর আলোচনায় চলিত ভাষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন।

১। মূলতঃ সংস্কৃতকে আদর্শ ক'রে সাধুভাষার সৃষ্টি হয়েছিল বলেই সাধুভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব অধিকতর। এর পরিচয় পাওয়া যায় প্রথমতঃ তৎসম ও আভিধানিক শব্দের আধিক্যে, দ্বিতীয়তঃ সমাসবাহুল্যে, তৃতীয়তঃ কথ্যভাষার ও উপভাষার শব্দবর্জনে এবং চতুর্থতঃ কিছু কিছু ইডিয়াম-অনুসরণে। সাধুভাষার এই যে লক্ষণগুলির কথা এখানে উল্লেখ করা হ'লো, এগুলো কালক্রমে ক্ষয়িত হ'তে হ'তে শরৎচন্দ্রের হাতে প্রায় চলিত ভাষার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। তখন কেবল খোলসটাই থাকে সাধুভাষার। প্রবাদ-প্রবচন ও ইডিয়ম অর্থাৎ বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলিত ভাষার সমৃদ্ধি অনেক বেশি, কারণ এজাতীয় অনেক প্রয়োগই সাধুভাষায় খাপ খায় না।

২। সাধুভাষায় তির্যক কারকের বহুবচনে শব্দের সঙ্গে-'দিগ'-প্রত্যয় যোগ ক'রে তার সঙ্গে বিভক্তি যোগ করা হয়, চলিত ভাষায় সাধারণতঃ 'দিগ-' স্থলে '-দে-' ব্যবহৃত হয়—'আমাদিগকে > আমাদের'। সাধুভাষায় অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে অনেক সময় স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয় যুক্ত হ'তো—'হইলেক, হইবেক'। চলিত ভাষায় তা বর্জিত হয়েছে। অসমাপিকা '-ইয়া, -ইতে, -ইলে' প্রভৃতি বিভক্তি সাধু ভাষায় যুক্ত হয়, চলিত ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে এরা সংক্ষিপ্তায়তন হয়েছে।—করিতে > করতে, করিয়া > ক'রে, করিলে > করলে।

৩। সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়া ও সর্বনাম পদে। সাধুভাষায় এদের প্রাচীন পূর্ণ রূপটি ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে ভাষা বিবর্তনের ফলে কালক্রমে এদের যে সংক্ষিপ্ত রূপ কথ্যভাষায় পরিণতি লাভ করেছে, চলিত ভাষা সেইরূপগুলোকেই গ্রহণ করেছে। মধ্যযুগীয় এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতি চলিত ভাষায় একেবারে বর্জিত হ'য়েছে। অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি চলিত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪। সাধুভাষায় ব্যবহৃত পূর্ণ রূপ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত রূপ (ক্রিয়াপদের)

করিতেছি—করছি, কচ্ছি
করিতেছিলাম—করছিলাম, কচ্ছিলাম
করিয়াছি—করেছি
করিয়াছিলাম—করেছিলাম
করিলাম—করলাম, করলাম
করিতে—করতে
করিয়া—ক'রে
করিলে—করলে

(সর্বনাম পদের)

তাহা—তা', ওটা
তাহার—তার
তাহাদিগের—তাদের
যাহাদিগকে—যাদের
ইহা—এ/এটা

৬। (অন্যান্য ক্ষেত্রে)

শ্রবণ করিয়া—শুনে
লম্ফ প্রদান—লাফানো
তোমা দ্বারা/কর্তৃক—তোমাকে দিয়ে
ইহা অপেক্ষা—এর চেয়ে

৭। সাধুভাষার রূপ	মধ্যযুগীয়/(অপিনিহিতি)	চলিত ভাষার অভিশ্রুতি
	পূর্বাঞ্চলীয় রূপ	**জাত রূপ**
হাটিয়া	হাইট্যা	হেটে
হাটুয়া	হাউট্যা	হেটো
আজি/আজ	আইজ	আজ
করিয়া	কইর‍্যা	ক'রে
		স্বরসঙ্গতি-জাত রূপ
দেশি		দিশি
বিলাতি		বিলিতি

৮। দ্ব্যক্ষরপ্রবণতা চলিত ভাষায় অতিশয় প্রবল বলে সাধুভাষায় শব্দগুলো চলিত ভাষায় রূপান্তরিত হ'য়েছে—করিব > করবো ; গামোছা > গামছা, যাইতেছি > যাচ্ছি। পদমধ্যস্থ 'হ'-কারের লোপপ্রবণতাও চলিত ভাষার অপর এক বৈশিষ্ট্য,—'তাহার > তার, কহিতেছি > কইছি, সিপাহি > সিপাই, ফলাহার > ফলার প্রভৃতি। ধ্বনিপরিবর্তনের আরও কতকগুলো রীতি চলিত ভাষায় প্রচলিত থাকায় সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে তার পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে ঃ—স্বরভক্তির ফলে—মিত্র >

মিত্তির, শ্রী > ছিরি, স্নান > সিনান, নাওয়া, চান ; সমীভবন-প্রবণতার ফলে—এতদিন > অ্যাদ্দিন, তর্ক > তক্কো, গল্প গপ্পো ; য়-শ্রুতির ফলে—মা + এ > মায়ে, ভাই + এ > ভাইয়ে ; স্বরাগমের ফলে—স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা ; স্টেশন > ইস্টিশন ; বর্ণদ্বিত্বের ফলে—বড় > বড্ড, ছোট > ছোট্ট, সকাল > সক্কাল, কখনো > কক্‌খনো। চলিত ভাষায় অর্ধতৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার, কিন্তু সাধুভাষায় তা বর্জনীয়।

৯। সাধুভাষায় যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি, চলিত ভাষায় তা' যথাসম্ভব বর্জন করা হয়।—ভোজন করিয়া—খেয়ে, শয়ন করিলে—শু'লে, গ্রহণ করিতে—নিতে।

১০। বিভক্তি-স্থলে ব্যবহৃত অনুসর্গের ক্ষেত্রেও সাধু ও চলিত রীতিতে পার্থক্য রয়েছে। সাধুরীতির 'দ্বারা/কর্তৃক, অভ্যন্তরে, হইতে'—স্থলে চলিত রীতির 'সঙ্গে, দিয়ে, ভেতর, থেকে'।

১১। সাধুভাষায় বাক্যে পদক্রম-বিন্যাসরীতি যে-রকম কঠোরভাবে অনুসৃত হয়, চলিত ভাষায় ততোটা কঠোরতা মানা হয় না।—'সীতা রামের সহিত বনে গমন করিলেন'—'সীতা রামের সঙ্গে বনে গেলেন।'

চলিত ভাষার অপর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আছে—প্রাচীন শব্দ ও রীতির বর্জন ; তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগবাহুল্য এবং বৈয়াকরণিক ও পদ-স্থাপনরীতির সরলতা সম্পাদন। জন আব্রাহাম গীয়ার্সনের মতে বিশেষ করে হুগলীর উপভাষা হল শিক্ষিত জনের আদর্শ চলিত ভাষার মূল ভিত্তি—।'

> "I Purest most admired Bengali is spoken in the area marked as Central and...perhaps, that spoken in the District of Hooghly, near the river of the same name is the shade with which it is considered the most desirable to be familiar"[১২]

আবার ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কলকাতা ও নদীয়ার শিক্ষিতজনের কথ্য বাংলাই হল আদর্শ চলিত বাংলার ভিত্তি ঃ

> "The speech of the upper classes in the western part of the Delta and in Eastern Radha gave the literary language to Bengal, and now the educated colloquial of this tract, especially of the cities of Nadiya and Calcutta, has become the standard one for Bengali, having come to the position of which educated Southern English now occupies in Great Britain and Ireland.[১৩]

রামেশ্বর শ'র মতে—"বাংলার মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষার যে পাঁচটি প্রধান উপভাষা (রাঢ়ী, বঙ্গালী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী) সেগুলির মধ্যে কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের (হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা) রূপের উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সর্ববঙ্গীয় আদর্শচলিত ভাষা (Standard Colloquial Bengali—S.C.B)"[১৪] সাধুভাষা ও চলিত ভাষার তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বেশ কিছু সূত্র নির্দেশ করেছেন। যেমন—

(১) সাধারণত সাধুভাষার শব্দভাণ্ডারে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দ বেশি, কিন্তু চলিত ভাষায় তদ্ভব

ও দেশী-বিদেশী শব্দের আধিক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য এখন অবশ্য প্রায় নেই বললেই চলে।

(২) সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা সাধু ভাষায় বেশি, চলিত ভাষায় কম।

(৩) সাধু ভাষায় সর্বনামের পূর্ণ, বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন—তাহা, যাহা, তাহার, যাহার, তাহাদের, তাহাদিগের, যাহাদের, যাহাদিগের, ইহা, উহা ইত্যাদি। চলিত ভাষায় অনেক সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন—তা, যা, তার, যার, তাদের, যাদের, এ, ও ইত্যাদি।

(৪) ক্রিয়ারও অনেকক্ষেত্রে সাধু ভাষায় দীর্ঘরূপ প্রচলিত, চলিত ভাষায় প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন—সাধুভাষা ঃ করিয়া, করিতেছি, করিয়াছি, করিয়াছিলাম ইত্যাদি। চলিত ভাষায় সেখানে দেখা যায়—করে, করছি, করেছি, করেছিলাম ইত্যাদি।

(৫) বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত কতকগুলি অনুসর্গেও সাধুভাষা ও চলিত ভাষারমধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন—সাধুভাষা ঃ দ্বারা, সহিত, সমভিব্যাহারে, হইতে, অভ্যন্তরে ইত্যাদি। চলিত ভাষা ঃ দিয়ে, সঙ্গে, থেকে, ভেতরে বা মধ্যে ইত্যাদি।

(৬) যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধু ভাষায় বেশি, চলিত ভাষায় অপেক্ষাকৃত কম। যেমন—সাধুভাষা ঃ গমন করা, শয়ন করা, শ্রবণ করা, আহার করা ইত্যাদি। চলিত ভাষা ঃ—যাওয়া, শোয়া, শোনা, খাওয়া ইত্যাদি।

(৭) কথ্য ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন (Proverbs) ও বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ (Idioms) চলিত ভাষায় সহজেই খাপ খেয়ে যায়, সাধুভাষায় সেগুলির প্রয়োগ বিরল।

(৮) সাধুভাষার বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া—এই বিন্যাসক্রম সাধারণত লঙ্ঘন করা হয় না। চলিত ভাষার বাক্যে পদের বিন্যাসক্রম অতখানি যান্ত্রিক নয়, অনেকখানি নমনীয়।

সাধু ও চলিত ভাষা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রায় সমান্তরালভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন সাহিত্যে সাধুভাষা ব্যবহৃত হবে, না চলিত ভাষা ব্যবহৃত হবে—এই সমস্যা বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। বিভিন্ন মনীষী ও সমালোচক এই বিতর্কে এক-এক পক্ষে নানা যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন। আজ সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার বিতর্কের পরিশেষে বলা যায় বাংলা গদ্য প্রধানত দুইপ্রকার কথ্য ও লেখ্য। কথ্যভাষা বিভিন্ন অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন উপভাষা প্রচলিত। সর্বজন স্বীকৃত এই উপভাষাগুলি ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হল।

উপভাষা	অবস্থান
রাঢ়ী	মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ী—বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া। পূর্ব রাঢ়ী—কলকাতা, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)।
বঙ্গালী	পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম)।

উপভাষা	অবস্থান
বরেন্দ্রী	উত্তরবঙ্গ (মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা)।
ঝাড়খণ্ডী	দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ (মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর), পুরুলিয়া।
কামরূপী	উত্তর-পূর্ববঙ্গ (জলপাইগুলি, রংপুর, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা)।

এক-একটি উপভাষার অভ্যন্তরেও আবার নানা আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠতে পারে। এই রকম এক-একটি উপভাষার (dialect) মধ্যেও যে নানা আঞ্চলিক পৃথক রূপ গড়ে উঠে তাকে বিভাষা (sub-dialect) বলে। বাংলার উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ী ও বাঙ্গালীর বিস্তার খুব বেশি। এই জন্যে রাঢ়ী ও বঙ্গালী দুইয়ের অভ্যন্তরে একাধিক বিভাষা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপভাষা (dialect) রাঢ়ী। যদিও মোটামুটিভাবে রাঢ়ীর দু'টি প্রধান বিভাগ—পূর্ব ও পশ্চিম, তবু সূক্ষ্ম বিচারে রাঢ়ীর বিভাগ ৪টি। এগুলি হল ঃ (ক) পূর্বমধ্য (east central) ঃ কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া। (খ) পশ্চিম-মধ্য (west central) ঃ পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, হুগলী, বাঁকুড়া। (গ) উত্তম-মধ্য (north central) ঃ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ-মালদহ। (ঘ) দক্ষিণ-মধ্য উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (ডায়মণ্ড হারবার)।

পূর্বে বঙ্গালীর দু'টি বিভাষা ছিল—(ক) বিশুদ্ধ বঙ্গালী (ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর এবং (খ) চাটিগ্রামী (চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী)। এখন এই দু'টি বিভাষার মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে চট্টগ্রামের উপভাষা ঢাকার লোকে প্রায় বুঝতেই পারে না। এখন এ দু'টিকে স্বতন্ত্র উপভাষা ধরাই ভাল। বাংলা গদ্যের ক্রমটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল।

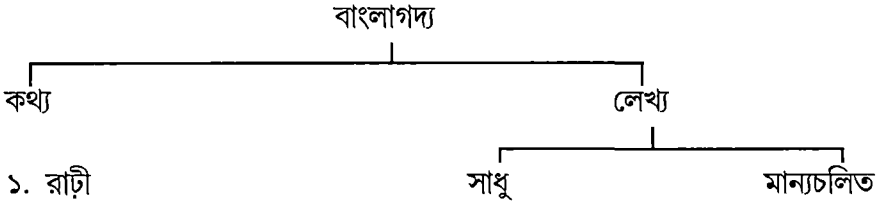

১. রাঢ়ী
২. বঙ্গালী
৩. বরেন্দ্রী
৪. ঝাড়খণ্ডী
৫. কামরূপী

এখানে আমরা বাংলা কথ্য বিভিন্ন কথ্য বিভিন্নরূপগুলি দেখলাম। কিন্তু আমাদের আলোচ্য লেখ্যমান্য চলিতভাষা বিষয়ক আলোচনা। বাংলা লেখ্য গদ্যের সৃষ্টি মধ্যযুগে। সে যুগের দলিল দস্তাবেজে, চিঠিপত্রে, গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়। সেই গদ্যের কাঠামো সাধুভাষার। আবার কোথাও

কোথাও সাধু রীতি ও কথ্যরীতি পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগের কথ্যভাষার যে অপিনিহিতি দেখা দিয়েছিল তার পূর্ববর্তী রূপটাই সাধারণভাবে বাংলাপদ্যে ও সেকালের সাধুভাষায় পাওয়া যায়। অপিনিহিতি, স্বরসঙ্গতি, ও অন্যান্য ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে কালক্রমে সারা বাংলায় বহুতর উপভাষা গড়ে ওঠে। তার পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। পরবর্তীকালে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্যে, গুরুগম্ভীর, শব্দ সমষ্টির সমারোহ এবং ক্রিয়ারূপ ও সর্বনাম রূপের পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে সাধুভাষা দীর্ঘ দিন বাংলা সাহিত্যকে লালন করেছে। এই সাহিত্যিক সাধুভাষাকে বলা হয় 'প্রমিতভাষা' (High Bengali / Standard Literary Bengali)। সাধুরীতির পাশাপাশি কোলকাতা অঞ্চলের মুখের ভাষা কিঞ্চিৎ মার্জিত পরিশীলিত আধারে বিধৃত হয়ে 'চলিত ভাষা' (Standard Colloquial Bengali) সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্র উপন্যাসে চলিত গদ্যরীতি মূল ভিত্তিই হল এই Standard Colloquial Bengali। এই ভাষা সরাসরি মুখের ভাষা নয়। এই ভাষা একপ্রকার সাহিত্যিকভাষা তাই এই ভাষা কৃত্রিম। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই ভাষার পরিচয় দিয়েছেন—"এই অঞ্চলের ভাষাই সাহিত্য দখল করে বসেচে। যেটাকে লেখা ভাষা বলি সেটা কৃত্রিম, তাতে প্রাণপদার্থের অভাব, তার চলৎশক্তি আড়ষ্ট, সে বদ্ধ জলের মতো, সে ধারা জল নয়। তাতে কাজ চলে বটে কিন্তু সাহিত্য শুধু কাজ চলবার জন্যে নয়, তাতে মন আপনার বিচিত্র লীলার বাহন চায়। এই লীলাবৈচিত্র্য বাঁধা ভাষায় সম্ভব হয় না। এইজন্যেই কলকাতা অঞ্চলের চলতি ভাষাই সাহিত্যের আশ্রয় হয়ে উঠেচে। একদা যখন সাধু ভাষার একাধিপত্য ছিল তখনো যে কোনো জেলার লেখক নাটক প্রভৃতিতে কলকাতার কথাবার্তা ব্যবহার করেচেন, কখনোই পূর্ব বা উত্তরবঙ্গের উপভাষা ব্যবহার করেন নি—স্বভাবতই কলকাতার চলতি ভাষা তাঁরা গ্রহণ করেচেন। এর থেকে বুঝবে সাহিত্য স্বভাবতই কোন্ প্রণালী অবলম্বন করেচে। কলকাতার কথিত ভাষার মধ্যেও সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। লন্ডনেও ভাষার একটা নিম্নস্বর আছে তাকে বলে কক্‌নি। সেটা সাহিত্যভাষা থেকে দূরবর্তী। আমাদের চলিত ভাষামূলক আধুনিক সাহিত্য ভাষার আদর্শ এখনো পাকা হয়নি বলে লেখকদের রুচি ও অভ্যাস-ভেদবশত শব্দব্যবহার সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার আছে। আরো কিছুকাল পরে তবে এর নির্মাণকার্য সমাধা হবে।[১৫]

পরবর্তী অধ্যায়ে সাহিত্যিক চলিত গদ্যের ক্রমটি আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থসূত্র

১। শ' রামেশ্বর, ১৪০৩, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃ. ৬৬৪।

২। সেন সুকুমার, ১৯৭১, ভাষার ইতিবৃত্ত, একাদশ সংস্করণ, কলকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, পৃ. ১৮২।

৩। সেন মুরারি মোহন, ১৯৮৯, ভাষার ইতিহাস কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, পৃ. ১৫৩।

৪। ভট্টাচার্য পরেশচন্দ্র, ১৯৯৩, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, কলকাতা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী।

৫। **Chatterji Suniti Kumar, 1970, The Origin and Development of the Bengali Language, London, P-134.**।

৬। শ' রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পূর্বোক্ত।

৭। সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত।

৮। সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত।

৯। সেন মুরারি মোহন, ভাষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত।

১০। চক্রবর্তী শ্যামাপদ, সরল বাঙলা ব্যাকরণ, পৃ. ৫, সূত্র সেন মুরারি মোহন, পূর্বোক্ত।

১১। ভট্টাচার্য পরেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত।

১২। **Grierson, George Abraham : Linguistic Survey of India, 1968, Vol. V, Part-I, Delhi– P-18.** সূত্র : শ' রামেশ্বর, পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৬৩

১৩। **Chatterji Suniti Kumar, 1970, The origin and Development of the Bengali Language, Vol-1, London,** সূত্র—শ' রামেশ্বর, পূর্বোক্ত।

১৪। শ' রামেশ্বর, তদেব। পৃ. ৬৬২

১৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা ভাষা পরিচয় রবীন্দ্ররচনাবলী, দশমখণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১.২ চলিত গদ্যের ক্রমবিকাশ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গদ্যের কোন মর্যাদা ছিল না। শুধু বাংলা সাহিত্য নয় যে কোন নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় পদ্যই ছিল একমাত্র মাধ্যম। ষোড়শ শতাব্দীর আগে বাংলা গদ্যের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা সাধুগদ্যের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় "শেক শুভোদয়া"য়। সপ্তদশ শতাব্দীর দলিল দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সে যুগের দলিল দস্তাবেজে বাংলা গদ্য কেমন ছিল তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

(ক)

শ্রীশ্রীহরি — সন ১১৭৮ সাল

শরনং — ২৯ পৌষের খত

সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘে রটন্তি চতুর্দশীতে শ্রীশ্রী দুই প্রতিমার স্থাপন করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দিননাত রায়কে এথা পাঠাইবে ফিতরত আলি খাঁ এথা পঁহুচে নাঞি দাখিল হইলে তাঁহার চলন মাফিক ব্যবহার হবেক শ্রীযুত মিস্তর মেদলটীন সাহেবকে জে খত এ পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতেছি তাহাতে গোন্ধ না দিয়া মহুর করিয়া পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোন্ধ দিয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা আপনার মঙ্গলবার্তা লিখিয়া স্থির রাখিবা কিমধিক ইতি।[১] (মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি)*

(খ) "বাবা মহারাজ গজশীক্কার রাজা (অর্থাৎ নিজ মুদ্রা প্রচলন করিবার অধিকরযুক্ত) কখনো হিন্দোস্থানের পাতসাহেবের মোতাবিয়ত (বশ্যতা) করেন নাই আপন মুলুকের পাতসাহি করেন...রঙ্গপুর জীলা মধ্যে অনেক জমিদারের স্ত্রীলোক ও বালক জমিদার তাহারা আপন এক্তিয়ারে আপন আপন জমিদারি মালগুজারি (রাজস্ব আদায় দেওয়া) করিতেছে আমার বর্তমানে এমত হওয়াতে অন্য অন্য জমিদার হইতেও বাবা মহারাজ জঘন্য হইতেছেন এ বড় সরমের কথা এ রাজ্যের রেত্তাজ (রীতি) মতে জিবন মৃতার ন্যায় হইতেছি সাহেব ধর্ম্ম অবতার আমি নিতান্ত স্বরণাগত আমার ও বাবা মহারাজের হুরমত (সম্মান) দেত্তা নেত্তা মালিক সাহেবেরা সায়াগীর (আশ্রিত) প্রতি নেকনজর (অনুগ্রহ) রাখিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক হুরমত রক্ষার্থে আমার ও বাবা মহারাজের আরজ কবুল হুকুম হবেক।"[২] (মহারাণী কমতেশ্বরীর একটা চিঠি)*

১৭৩৫ সালের ২৮ মে গ্যাসপার কর্ণ নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক বর্ধমানের আত্মারাম বাগদীর ছেলেকে আজিরপাট্টা লিখিয়ে নিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। আত্মারাম লিখেছেন ঃ

(গ) "আমার বেটা নামে শ্রীশ্যামা বাগদী ছোকরা বএস আট বৎসর বর্ণ কালা ইহার কিমত মান্দ্রাজী সাত তঙ্কা পাইয়া আমি সেচ্ছাপূর্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম। তুমি ইহাকে বাতিত্বর (Baptise) ক্রিস্তাঙ করিয়া খোরাক পোষাক দিয়া আপন খেদমতে রাখহ। এই ছোকরার দান বিক্রয় সত্বাধিকার তোমার। আমার সহিত এবং আমার ওয়ারিশের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা নাই এই করারে ছোকরা বিক্রয় করিলাম।"[৩] (দাসপ্রথা)*

---

* বানান ও ভাষা অপরিবর্তিত

সজনীকান্ত দাসের মতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধু গদ্যের কাঠামো তৈরি হতে থাকে—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে বাঙ্গালা গদ্যের সাধুরূপ নিতান্ত অপরিণত ছিল না তাহারও উপযুক্ত প্রমাণ মিলিয়াছে সেই সময়ে নেপালে রচিত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক একটি নাটকের ভাষা সাধু বাঙ্গালাই।"[৪]

ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে বাংলাদেশে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পর্তুগীজরা এদেশে আসেন। বাণিজ্য সম্ভারের পাশাপাশি খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের জন্য পাদরীরা এদেশে এসে বাংলাভাষা শিখে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও রচনা করতে আরম্ভ করেন। একেই বাংলা গদ্যের প্রকাশ্য ব্যবহারের সূত্রপাত বলা যেতে পারে। দোম আন্তোনিও রোজারিওর-"ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ।" গ্রন্থটির বাংলা গদ্যের এক দুর্লভ প্রাচীন নির্দশন। দোম আন্তোনিওর নিবন্ধের ভাষা সাধুভাষা কিন্তু তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রোমান ক্যাথলিক রচিত অপর এক গ্রন্থ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" এই বইটি আবার সাধুগদ্যের নয়। গ্রন্থদুটির ভাষার নমুনা এখানে তুলে ধরা হল। সুতরাং বাংলা গদ্য সৃষ্টির প্রাকলগ্নে সাধুও কথ্যরীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয় শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে সাধু ও কথ্যরীতি মিশ্রণ চোখে পড়ে।

(ঘ) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ভাষার নমুনা—

গুরু। অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে ঃ আমি মালা জপি না ; তথাচ আন ধরণ ভজনা করি ; জপি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন ; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।—পৃ. ৫৪

(ঙ) 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'-এর নমুনা—

ব্রাহ্মণ। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশর এমত করেন ; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেতো কালের পাপে করমাঙ্কিতে লওয়াএ।

—পাণ্ডুলিপি পৃ. ৬

"পরামনন কর না কেন স্বর্গরাজ্য নিকটবর্তী একথা ঘোষণা করত যোহন ডুবক সেকালে য়িদুদাহ-দেশের অরণ্যে আইল য়িহুদিহের পথ প্রস্তুত কর তাঁহার পথ সোজাকর অরণ্যে চিৎকারকারী। একজনের এইরব যাহার বিষয়ে বিশাঈয়াহ আচার্যের মুখখাৎ এই কথা গেল এই তিনি।"[৫]

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বাইবেলের অনুবাদ।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'কথোপকথন' গ্রন্থটি শ্রেণিবিশেষের কথ্যভাষার নিদর্শন

হিসাবেই সঙ্কলিত হয়েছিল। এই প্রস্তাবের রচনারীতি অবিমিশ্র সাধুভাষা। অপরগুলির রচনারীতি কথ্যভাষা আশ্রিত।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর রচনায় সাধুগদ্যের পাশাপাশি কথ্যরীতির অনেক রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মার রচনা, লিপিমালার ভাষা, কথ্যভাষার অনুসারী। লিপিমালার রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষার্থীকে চলিত ভাষায় দেশীয় লোকদের বৈষয়িক ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া। রামরাম বসু গ্রন্থের ভূমিকাতেই সেই কথা বলেছেন। সমসাময়িক আর এক লেখক গোলকনাথ বসুর রচনাতেও কথ্য ভাষার অনুসরণ রয়েছে। আবার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনটি পৃথক রচনারীতি অনুসৃত হয়েছে। কথ্যরীতি, সংস্কৃত রীতি ও সাধুরীতি। তবে কথ্যরীতি কতকগুলি লোক প্রচলিত গল্পের বর্ণনায় ব্যবহৃত। সমকালীন গদ্যের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হল।

(ক) রাজা প্রদাপাদিত্য চরিত্র

"বেগম বিসন্নবদনা খিদ্যমানা অতি কাতরা হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।—চিত্রের পুথলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ শোকেতে কাতরা হইয়া ধরণিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। শান্তনা করে এমত কেহ নাই হা নাথ হা নাথ করিয়া বহুবিধ বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই মতে ভূমিতে পড়িয়া বেগম বিলাপ করে। বেগমের বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায় হায় রবে রোদন করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনান্তঃকরণ কোমল হইল ছল ছল আক্ষিতে রোদন করিলেন।"[৬]

(রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), রামরাম বসু)

(খ) মাইয়া কন্দল

"তুমি কোথা গিয়াছিলা পাড়া বেড়ানী সাঁজের কায় কাম কিছু মনে নাই বটে।
কি কাযের দায় তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো।
আমি কাযে ঠেকি নাই তুই সকল কাজে ঠেকিয়াছিস।
তুই আমার কি কাযে ঠেকিয়া এত কথা কইস লো।
চক্ষুখাকী তোর চক্ষের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না এ সকল কায কে করিয়াছে।
তোর যে বড় ঠেকারা হইয়াছে এক দিন কায় করিয়া এত কইস? আমি তোর সকল জানি।
পুতখাকী তুই আমার কি জানিস। তোর মত পাড়া ২ মরদের কাছে আমি যাই না।
গস্তানী! তুই যেমন উহাকে ভাই ২ বলিস রাত্রে তাহারে লইয়া থাকিস। সেমত আমরা নই।"[৭]

(গ) বত্রিশ সিংহাসন (নবমী পুত্তলিকার কথা)

"ভোজরাজ পুনর্ব্বার এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন ইতোমধ্যে নবমী পুত্তলিকা কহিলেন অবন্তীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা রাজ্য করেন। ঐ নগরীতে এক যোগী আসিয়া উদ্যানের মধ্যে থাকিলেন সে যোগী সর্বজ্ঞ এবং বাক্‌সিদ্ধ নিরাকাঙ্ক্ষ

পরম বৈরাগ্যযুক্ত যাহাকে যাহা বলে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। যোগীর এই সকল বৃত্তান্ত রাজা লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া যোগীকে আনিবার কারণ সভাসদ্ পন্ডিতরদিগকে পাঠাইলেন যোগী পন্ডিতর প্রমুখাৎ রাজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না। কহিলেন আমার রাজার নিকট যাওয়ার প্রয়োজন কি। যে পুরুষ নিষ্কাম সে তৃণের ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে যে নিষ্পাপ সে তৃণতুল্য যমকে জানে। যে নির্ল্লোভ সে রাজৈশ্বয্যকে তৃণপ্রায় জানে। যে নিষ্প্রয়োজন সে রাজাকে তৃণসমান জানে। যোগীর এই সকল কথা পন্ডিতের শুনিয়া সাক্ষাৎ আসিয়া কহিলেন। রাজা শুনিয়া বুঝিলেন যোগী ভাল বটে।...."[৮]
বত্রিশ সিংহাসন (১৮১৬) (নবম পুত্তলিকতার কথা)

বাংলা ভাষার গদ্যচর্চা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর হাতে শুরু হলেও কলেজের শিক্ষকদের রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলি বাংলাগদ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে তেমন কিছু সহায়তা করতে পারেনি। পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার ছিল সীমাবদ্ধ। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি ছোট মাসিক পত্রিকা বের করে। পরের 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই সময়েই প্রকাশিত হয় হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' (Bengal Gazette)। এই সাময়িক পুস্তিকা ও সংবাদপত্রের সূত্রধরেই বাংলাগদ্যের উন্নতির পথ অবাধ হয়েছিল। সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংবাদ ও সরস কাহিনী পরিবেশনের দ্বারাই সাময়িক ও সংবাদপত্র সমসাময়িক বাঙ্গালা গদ্যের সামর্থ যুগিয়ে প্রতিদিনের কাজকর্মের উপযুক্ত সর্বসাধারণের উপভোগ্য করে তোলে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সকলেই 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'মাসিক পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ' 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'আর্যদর্শন', 'বান্ধব', 'নবজীবন' 'সাহিত্য', 'সাধনা', 'ভারতবর্ষ', 'সবুজপত্র', 'প্রবাসী' ইত্যাদি কোন না কোন পত্রিকা থেকে উঠে এসেছেন। সমকালীন কয়েকটি পত্রিকার রচনারীতি এখানে উল্লেখ করা হল।

(ক) সংস্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত।

—আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পড়িবার যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইয়াছে ঐ ছাত্রদিগের কেবল সংস্কৃত ভিন্ন অন্য আর চর্চ্চা করিতে হইবেক না।

এই সুসম্বাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যেহেতু যৎকালে সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদের ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন তৎকালে আমরা ইহার প্রতিবাদী ছিলাম কেন না ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সন্তানগণকে ইঙ্গরেজী পড়াইলে কোন উপকার নাই প্রভূত অপকার বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরূপে প্রমাণ দর্শাইয়াছিলাম তথাচ নিয়মকর্ত্তা সাহেবেরা কোন মতেই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহতে কেবল গবর্ণমেণ্টের কতক গুলিন নিরর্থক অর্থনাশ হইল মাত্র তাহাও অল্প নহে আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভ অবধি রহিত কাল পর্যন্ত প্রায় ৬০। ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতগুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরানি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও

অশ্রদ্ধা করিলেন। এক্ষণে নিয়মকর্ত্তারা বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইয়াছেন যে সংস্কৃতপাঠক ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী অধ্যয়নে কোন উপকার নাই। যাহা হউক অতঃপরেও যে ঐ কুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের মঙ্গলজনক বটে।

(সমাচার চন্দ্রিকা, ১২ই ডিসেম্বর ১৮৩৫। ২৮শে অধ্যয়ন, ১২৪২)

(খ) বঙ্গভাষা-চর্চ্চায় ঔদাসীন্য

....জাতি মাত্রেই আপনাপন জাতীয় ভাষার প্রতি যত্ন করে, এবং বিশিষ্টরূপে তাহা শিক্ষা করিতে অনুরাগি হয়েন, কিন্তু কি চমৎকার, এই দেশের মনুষ্যেরা জাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, ইংরাজী ভাষানুশীলার্থ অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগের অনুরাগ ও অযত্ন দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। বহুদিন হইল ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই রাজ্যের সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু আমলারূপে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের মধ্যে প্রায় তাবতেই বঙ্গভাষা লিখন পঠনে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যে সকল দরখাস্ত অথবা কাগজ পত্র লিখিয়া থাকেন তাহাতে কতক বাঙ্গালা, কতক পারস্য, কতক ইংরাজী এবং কতক ওলন্দাজি শব্দ ব্যবহার করেন, একারণ তাঁহারা ব্যতীত বঙ্গভাষায় সুনিপুণ অপর কোন ব্যক্তি ঐ সকল কাগজপত্রের সমুদয় মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন না, গবর্ণমেণ্ট ঐ আমলাদিগের শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ না করাতেই রাজবিচারে অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং দেশীয় লোকেরাও বঙ্গভাষানুশীলনে অমনোযোগি হইয়াছেন, যেহেতু বিচারালয়ের কর্ম্মার্থিরা জানিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি রাজার দৃষ্টি নাই, যেরূপ হউক লিখিতে পারিলেই বিচারপতিরা সন্তুষ্ট হয়েন, এজন্য তাঁহারাও বঙ্গভাষার প্রতি অযত্ন করিয়া কেবল আইনের ধারা সকল কণ্ঠস্থ করত রাজকার্য্যে মনোনীত হইয়া থাকেন, অতএব আমারদিগ্যে অবশ্য বলিতে হইবেক যে রাজপুরুষেরা সমুদয় বিচারালয়ে যে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র যত্ন দেখিতে পাই না, তাঁহারা এই দেশে ইংরাজী বিদ্যা প্রচার নিমিত্ত বিবিধ প্রকার বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া রাজভাণ্ডার হইতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচুর্য্যার্থ অল্প ব্যয়ও করিতে পারেন না।

এই বিষয়ে আমরা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে যদ্রূপ দোষি করিতে পারি গবর্ণমেণ্টকে তদ্রূপ দোষি করিতে পারি না, কারণ তাঁহারা ভিন্নদেশীয় মনুষ্য, অধুনা এতদ্দেশের মনুষ্যেরা যদি স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগি হয়েন তবে অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন প্রকার নিষেধ করেন না, বরং উৎসাহ প্রদান করেন,...কিন্তু এই পরিতাপ যে আমারদিগের দেশীয় মনুষ্যেরা জাতীয় ভাষা শিক্ষা করা একেবারে অকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে মুক্তকণ্ঠে দেশের ভাষার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না,...।
(সংবাদ প্রভাকর, ৫ এপ্রিল, ১৮৪৮)

(গ) দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার (নিজস্ব সংবাদ-দাতার বিবরণ)

সোমবার রাত্রিতে বহু দর্শকের সম্মুখে উপরি-উক্ত নাট্যশালায় ওথেলো নাটকের অভিনয় নয়।...

অভিনেতারা সকলেই কিশোর যুবক। ইঁহারা সকলেই পরলোকগজ গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি।...এই যুবকেরা মিঃ ক্লিঙ্গারের শিক্ষায় নাট্যাভিনয়

202088
24 MAR 2003
NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY

প্রদর্শন করেন। মিঃ ক্লিঙ্গার কলিকাতা মাদ্রাসার এবং বোধ করি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীরও একজন অধ্যাপক।

কেবল হিন্দু যুবকদের লইয়া সংগঠিত অভিনেতৃবর্গের দ্বারা একটি ইংরাজী নাটকের অভিনয় এই প্রথম...।

...এই যুবকেরা যে ভাবে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে এদেশীয় জনগণের মানসিক উৎকর্ষাভিলাষী দর্শকমাত্রই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই"।[৯]

(ঘ) অশৌচ বিধি

"অতঃপর সহমরণের ব্যবস্থা করিতেছি। সহমৃতা স্ত্রীর ত্রাহাশৌচ যদ্যপি হয় তথাপি স্বামির পূর্ণাশৌচ হয়। স্বামিপিন্ডের তার পিন্ড দিবেক। অনুমৃতার বিশেষ স্বামির অশৌচের মধ্যে যদি অনুমরণ করে তবে স্বামির অশৌচ হয়। কিন্তু যে দিবসে অনুমরণ করে সেই দিবস হইতে তিনি (তিন) দিবসের মধে (মধ্যে) পূরক পিন্ড দিবেক। স্বামির অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ করিবেক। পতিকে আলিঙ্গন করিয়া সে স্ত্রী মরে তাহাকে সহমৃতার ব্যবহার করিবেক। সে স্ত্রী পীতমরণানন্তর দুই চারি দিবস ব্যতিরেকে পাদুকাদি লইয়া মরে তাহাকে অনুমৃতার ব্যবস্থা করিবেক।"[১০]

.....শ্রীরাজচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ সাক্ষরমিদং পুস্তকঞ্চ।

(ঙ) আমরা উপরে নব্যতন্ত্রের যে সমস্ত ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা করিলাম, ইংরাজী অধ্যয়নই ইঁহাদিগের কাল স্বরূপ হইয়াছে। ইংরাজী ইহাদিগের শুভ ফলদায়ী না হইয়া বিপরীত ফলোপধায়ী হইয়াছে। ইংরাজী ইঁহাদিগের হিন্দুধর্ম্মরূপ দুর্ভেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। হিন্দধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রধান গুণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ইংরাজী প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম উৎসন্ন হওয়াতে সে গুণও সেই সঙ্গে সঙ্গে উৎসন্ন গিয়াছে। উল্লিখিত মহাপুরুষরা পরস্ত্রীস্পর্শে ভীরু নহেন, সুরাপানেও পরাঙ্মুখ নন। এবং অসৎ বিষয় সেবাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের চরিতার্থতা সম্পাদন পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। ক্ষোভের বিষয় এই, ইংরাজী অধ্যয়ন ইহাদিগের এই সকল দোষের নিবারণে সমর্থ না হইয়া প্রত্যুত এই সমস্ত দোষের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজীর এ সমস্ত দোষ নিবারণ ক্ষমতা নাই, পাঠকগণ এ বিবেচনা করিবেন না, অন্যদেশের কথা থাকুক, এদেশের এই নব্য সম্প্রদায়েরই অনেকের ইংরাজী প্রভাবে চরিত্র এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, অন্যকে তদনুকরণে একান্ত স্পৃহাবান্ ও যত্নশীল দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে উপরি বর্ণিত গুণধরেরা হিন্দুধর্ম্ম বিনিময় করিয়া সভ্যতাসহচর দোষগুলি ক্রয় করিয়াছেন।" (সোমপ্রকাশ, ১০.১২.১৮৬০)

(চ) ঢাকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জনকয়েক যুবক তাঁহাকে একখানি আড্রেস দেন। তখন একজন বক্তৃতাকালীন বলেন সে "আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" মাইকেল মধুসূদন ইহার উত্তরে

বলেন "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এই ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যেই বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।"

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২

বাংলা গদ্যের বিকাশে সেই যুগে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর। রামমোহন সর্বপ্রথম বাংলাকে যুক্তিতর্কের বাহন করে গদ্যের বিস্তার ঘটালেন। বিদ্যাসাগরের হাতে গদ্য পেল নিজস্ব ছন্দ ও কোমনীয়তা। বিদ্যাসাগরের আগে যারা গদ্যচর্চা করেছেন তাঁরা কেউই বাংলা গদ্যের নিজস্ব পদ বিন্যাসরীতি আবিষ্কার করতে পারেনি। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার পার্থক্যটি বুঝতেন—সংস্কৃত পদবিন্যাসরীতি গাণিতিক নিয়মে বাঁধা কিন্তু বাংলা ভাষা বিশ্লেষণধর্মী। বিদ্যাসাগর বাংলা সাধুগদ্যকে পূর্ণসমর্থন করলেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ বেতাল 'পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) বাংলা সাধুভাষার পূর্ণাঙ্গ রূপটি প্রকট করল। বাংলা গদ্য সংস্কৃত ভাষার জড়তা থেকে মুক্তি পেয়ে সাহিত্যের আটপৌরে ব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করল। কয়েকটি ভাষার উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল।

(ক) "নিবর্ত্তক তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায্য। ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করান, সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। দ্বিতীয়ত ঐ সকল বচনেতে এবং বচনানুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্প-বাক্যতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারীতাদি বচনে আছে, তদানুসারে করিয়া থাকহ, অতএব কেবল জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা হয়।"[১১] রাজা রামমোহন রায়, (সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তক সম্বাদ) (প্রথম প্রকাশকাল—১৮১৮/১৯ সাল)

(খ) বেতাল কহিল, মহারাজ ভোগবতী নগরীতে অনঙ্গসেন নামে অতি প্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। চূড়ামণি নামে সর্ব্বগুনাকর শুকপক্ষী সর্ব্বকাল তাঁহার সন্নিহিত থাকিত। একদিন রাজা কথাপ্রসঙ্গে চূড়মণিকে জিজ্ঞাসিলেন, "শুক, তুমি কি কি জান?" সে কহিল, "মহারাজ, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালত্রয়ের বৃত্তান্ত জানি।" তখন রাজা কহিলেন "যদি তুমি ত্রিকালজ্ঞ হও, বল, কোন্ স্থানে আমার উপযুক্ত রমণী আছে?" চূড়ামণি নিবেদন করিল, "মহারাজ মগধদেশের অধিপতি রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামে এক কন্যা আছে। সে পরম সুন্দরী ও সাতিশয় গুণশালিনী, তাহার সহিত মহারাজের বিবাহ হইবে।"[১২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি (চতুর্থ উপাখ্যান)

(বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।)

এরপর বাংলা গদ্য অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামগতি ন্যায়রত্নের হাত ধরে এগিয়েছে। এদের প্রত্যেকের ভাষাতেই সরসভাও কমনীয়তা আরো বেশি করে এসেছে। সংস্কৃত তৎসম শব্দের ব্যবহার ক্রমশ কমেছে। তবে সব ক্ষেত্রেই সাধুগদ্যের কাঠামো ব্যবহৃত হয়েছে।

গ। "এই পৃথিবী অতি পূর্বে একটি সুপ্রকান্ড অগ্নিগোলক ছিল। জীবজন্তু ওষধি প্রভৃতির চিহ্নমাত্র দেখা যাইত না। ক্রমে পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন পড়িল। ভিতরে প্রচন্ড অগ্নি-উত্তপ্ত দ্রবধাতু, বাইরে অগ্নিময় অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণ। সূর্যও তখন ঘোর বাষ্পময় মেঘে আবৃত। উত্তাপে অগ্নি পৃথিবী হইতে বারংবার উত্থিত হইয়া পুনরায় জলরূপে পড়িতে লাগিল"।[১৩] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জ্ঞান ও কর্মের উন্নতি)
(প্রকাশকাল—১৮৯৩ সাল)

বাংলা গদ্যকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর যেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন সেখান থেকে এক নতুন যুগ শুরু হল বঙ্কিমযুগ। প্রথম যুগে বাংলা ছিল ভাবপ্রকাশের ভাষা। ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগরের হাতে সরসতা লাভ করল। আর বাংলা গদ্য যথার্থ শিল্প সুষমায় উন্নীত হল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে "মানসী ও মর্ম্মবানী" যা লিখেছে তা যথার্থ :—

"ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভের পর হইতে বাঙ্গালায় যে-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল গদ্যে, সে তখনও ছিল সূতিকাগারে। রামমোহনের লোকাতীত প্রতিভায় শক্তিমান হইয়া সে সাহিত্যের ভাষা অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের সুললিত লেখনীমুখে তাহার ভিতর জলদগর্জ্জনের আভাস পাওয়া যাইত সত্য, কিন্তু সে সাহিত্য সুতিকাগারের শিশুর মত তার মায়ের জীবনের ছায়ামাত্র ছিল। জননী সংস্কৃতের সে ছিল ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। কেবল টেকচাঁদ তখন এক নতুন সুর ধরিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার যে একটা নিজস্ব সৌষ্ঠব আছে—যাহার লালিত্যে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সুমধুর—সেই সোষ্ঠব তিনি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন গদ্যে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙ্গালার এই নূতন সাহিত্য এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল—সূতিকাগারের শিশু পরিপূর্ণ যৌবনরসে টলমল করিয়া উঠিল। তার রূপে দেশবাসী মুগ্ধ হইল, রসিক মজিয়া গেল। রাজা রামমোহন যে শিশুর জাত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদ যাহার হাত ধরিয়া হাঁটাইয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সে পূর্ণ দীক্ষা লাভ করিয়া নবজীবনে পদার্পণ করিল। যে-জীবন এখন কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, অপূর্ব্ব গৌরবে সমৃদ্ধ হইয়াছে, দেশবিদেশে পূজা পাইয়াছে, তার সূত্রপাত যেখানেই হউক তার সত্য জীবনের আরম্ভ হইয়াছে বঙ্কিম—সাহিত্যে।"[১৪] (বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম)

বাংলা গদ্যের একেবারে প্রথম যুগে আমরা দেখেছি কথ্যভাষা ও সাধুভাষা পাশাপাশি অবস্থান করেছে। তারপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠী ও পরবর্তীকালে বাঙালী বিদ্বৎজন সাধুভাষার কাঠামোটিই গ্রহণ করেছেন। এবং গদ্যচর্চার যাবতীয় কাজকর্ম সাধুভাষাতেই হয়েছে। কিন্তু সাধু গদ্য জনসাধারণের মনের কথা তুলে ধরতে ক্রমশঃ অসমর্থ হয়ে উঠছিল। এই সময় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে স্কুল বুক সোসাইটির সহযোগী Vernacular Literature Committee (পরে Society) বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ গঠিত হয়। এই সমাজের

অনুকূলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এই পত্রিকার বিষয়বস্তু ছিল। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকা পড়ে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। তবে চলিতগদ্যের ইতিহাসে এই পত্রিকা বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি।

সেই সময় ১২৬১ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের 'মাসিক' পত্রিকা কথ্যভাষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন করে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রত্যেক সংখ্যার শীর্ষে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা থাকত—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পন্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"[১৫]

স্ত্রীলোকদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রচার এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হলেও—"শুধু জনসাধারণ বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের পড়িবার জন্য 'মাসিক পত্রিকা'র প্রস্তাবগুলি চলিত শব্দ পূর্ণ হালকা ভাষায় লেখা হয় নাই, বাংলা চলিত ভাষা শিক্ষার্থী ও বাঙ্গালী সমাজের জ্ঞানলাভেচ্ছ সাহেব দিগের ব্যবহারে লাগাও কতকগুলি প্রস্তাব রচনার উদ্দেশ্য ছিল।"[১৬]

এই 'মাসিক পত্রিকাতে'ই ধারাবাহিকভাবে বের হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'। যাকে বলা হয় বাংলা উপন্যাসের সূত্রধার। সেই 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষার প্রধানগুণ-এর ভাষা। এককথায় বলতে গেলে আলালের ভাষা হচ্ছে মিশ্র সাধুভাষা। সাধুভাষার যুক্তক্রিয়া পদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার তদ্ভবও দেশি শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ, সমাসযুক্তপদের পরিবর্জন, কথ্য ভাষার ব্যবহৃত ফারসী শব্দের কথ্যভাষা সুলভ বাক্যাংশ বা ইডিয়াম বা প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগ, একই সঙ্গে ক্রিয়া পদের ধাতু ও চলিত গদ্যের ব্যবহার। তবে আলাল ভাষা বাংলা গদ্যকে সঠিক পথ দেখাতে পারেনি।

আলালী ভাষার উদাহরণ।

"প্রথম যখন ইংরাজেরা কলকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে শেঠ ও বসাক বাবুরা সওদাগরী করিতেন, কিন্তু কলিকাতায় একজনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্ত্তা, ইশারা দ্বারা হইত। মানবস্বভাব এই যে, চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে কিছু ইংরাজী কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন-আদালতের ধাবকায় ইংরাজীর চর্চ্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রী ও আনন্দীরাম দাস অনেক ইংরাজী কথা শিখিয়াছিলেন। রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরাণীগিরি করিতেন ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন। তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪/১৫ টাকা করিয়া মাসে মাহিয়ানা দিতে হইত। পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুল-মাষ্টারগিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা তামস্‌ডিস্‌ পড়িত ও কথার মানে মুখস্থ করিত। বিবাহে অথবা ভোজের সভায় যে ছেলে আইন, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাহবা

দিতেন।"[১৭] প্যারীচাঁদ মিত্র, (আলালের ঘরের দুলাল) (প্রকাশকাল : ১৮৫৮ সাল)

"আলালের ঘরের দুলাল" সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শন' লেখা হল

"প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালি ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্‌নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও, সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধু-ভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সেদিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধ গম্য তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধু ভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক প্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং ফোঁটা কাটা অনুস্বরবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালি স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক, না বাড়ুক ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃত প্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু, বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কোন গদ্য গ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"[১৮]

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোমপ্যাঁচার নক্সা ও সমকালে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল

রেলওয়ে

"দুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া হতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেছে ; রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাল কাল অক্ষরে ছাপানো ইংরাজী বাঙ্গালায় এস্তাহার মারা গেছে। অনেকেই আমোদ করে বেড়াতে যাচ্ছেন-তীর্থযাত্রীও বিস্তর। শ্রীপাট নিমতলার প্রেমানন্দ দাস বাবাজীও এই আকালে বারানসী দর্শন কত্তে কৃত-সঙ্কল্প হয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বাবাজী শ্রীপাট জোড়াসাঁকোর প্রধান মঠের একজন কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে ; বাবাজীর অনেক শিষ্য-সেবক ও বিষয়-আশয়ও প্রচুর ছিল ; বাবাজীর শরীর স্থূল, ভূঁড়িটি বড় তাকিয়ার মত প্রকান্ড ; হাত পা-গুলিও তদনুরূপ মাংসল ও মেদময়।

বাবাজীর বর্ণ কষ্টিপাথরের মত, হুঁকোর খোলের মত ও ধানসিদ্ধ হাঁড়ির কত কুচকুচে কালো। মস্তক কেশহীন করে কামান, মধ্যস্থলে লম্বাচুলের চৈতন্যচুটকি সর্ব্বদা খোঁপার মত বাঁধা থাকতো ; বাবাজী বহুকাল কচ্ছ দিয়ে কাপড় পরা পরিহার করেছিলেন, সুতরাং কৌপীনের উপর নানারঙ্গের বহির্বাস ব্যবহার কত্তেন। সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে গোপীমৃত্তিকা মাখা ছিল ও গলায় পদ্মবীচি তুলসী প্রভৃতি নানাপ্রকার মালা সর্ব্বদা পরে থাকতেন। তাতে একটি লাল বনাতের বড় বালিশের মত জপমালার থলি পিতলের কড়ায় আবক্ষ ঝুল্‌তো"।[১৯]

বাংলা চলিত গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে 'আলালী ভাষা' ও "হুতমী ভাষা" উল্লেখযোগ্য অবদানের দাবী রাখে। তবে বাংলা গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান দীর্ঘস্থায়ী। সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে বাংলা গদ্যের অনেক সময় লেগেছিল।

বাংলা চলিত গদ্যের পক্ষে জোর সওয়াল করেন স্বামী বিবেকানন্দ। মূলত পরিব্রাজক, আধ্যাত্মিক সন্ন্যাসী হলেও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। তাঁর 'ভাববার কথা' গ্রন্থটি চলিত ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে চলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে মত দেন। তিনি চলিত ভাষা ব্যবহারের কথা বললেও একাধিক গ্রন্থে তিনি সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন।

১.১ অধ্যায়ে আমরা ভাষা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে সাধু ও চলিত গদ্যরীতিতে বুঝতে চেষ্টা করেছি। ১.২ অধ্যায়ে আমরা সাহিত্যিক গদ্য চর্চার ধারা ও সংবাদপত্রের গদ্যচর্চার ধারার মধ্য দিয়ে ভাষাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে গদ্যচর্চা যেমন এগিয়েছে তেমনি সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বাংলা গদ্যচর্চা ত্বরান্বিত হয়েছে, রচনার Frequency বেড়েছে পত্রিকার প্রয়োজনে লেখক বেশি করে গদ্যচর্চা করেছেন। আমরা নমুনা হিসাবে সেই ভাষা সংগ্রহ করেছি গ্রন্থের অনাবশ্যক ভারবৃদ্ধির কারনে নয়। তবে 'মাসিক পত্রিকা' 'আলালা ভাষা' 'হুতমী ভাষা'র প্রভাবে সাধুচলিত ভাষায় অনেকগুলি সাহিত্য রচিত হয়েছিল যেমন 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩)[২০] ও ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সমাজ কুচিত্র[২১] (১৮৬৫), হরিদাসের গুপ্তকথা (১৮৭৩)[২২] ইত্যাদি। সারদাচরণ মিত্র 'The Mookerjee's Magazine' (New Series, pt. 1) নভেম্বর ১৮৭২ সংখ্যার (PP274–284) On the Philology of the Bengali Language প্রবন্ধে বাংলা ভাষার বিবর্তনে প্রাকৃতের মধ্যস্থতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[২৩] ১৮৭৭ সালে শ্যামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় "The Calcutta Review' পত্রিকায় (Vol LXV PP 395–417) Bengali Spoken and Written নামক অষ্টম

নিবন্ধে বাংলা কথ্যভাষার ব্যাকরণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণমূলত লেখ্যভাষার ব্যাকরণ এবং বাংলা ভাষার আসল বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি ধরে পড়ে না।[২৪]

এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় এছাড়া বাংলা নাটকের সংলাপের ভাষা চলিত ভাষা চর্চার পথ প্রশস্ত করেছিল। সংলাপে চলিত ভাষা প্রথম ব্যবহার করেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' (১৮৬১) নাটকে। পরবর্তী বাংলা নাটকের সংলাপে চলিত ভাষা চর্চার পথ প্রশস্ত হয়েছে। এই পর্বকে চলিত গদ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষাপর্ব বলা যায়। 'আলালী ভাষা', 'হুতমী ভাষা' ও বিভিন্ন প্রবন্ধে মনীষীগণ কথ্য ভাষার পক্ষে প্রচার করলেও কথ্য ভাষা চলিত ভাষা সর্বজনের সাহিত্যিক ভাষা হয়ে উঠতে পারল না। তারজন্য আমাদের 'সবুজপত্র' থেকে 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি'র যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল।

গ্রন্থসূত্র

১। মহারাজ নন্দকুমার তাঁর পুত্র রাজা গুরুদাসকে এই চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি ১৭৭২ সালের জানুয়ারী মাসে লেখা হয়েছিল। সূত্র : মুর্শিদাবাদ কাহিনি, নিখিলনাথ রায়।

২। মহারানী কমতেশ্বরীর পত্র, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ২৮ নং পত্র।

৩। দেব, চিত্রা, ১৯৮০, পুথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা।

৪। দাস, সজনীকান্ত, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), বাং ১৩৬৯, কোলকাতা, মিত্রালয়।

৫। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বাইবেলের অনুবাদ।

৬। বসু রামরাম, ১৮০১, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

৭। কেরী উইলিয়াম, ১৮০১, কথোপকথন, কোলকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

৮। বিদ্যালঙ্কার মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৬, বত্রিশ সিংহাসন।

৯। সে যুগের ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় সম্পর্কে 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত ২৮.৯.১৮৫৩ তারিখের প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ

১০। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিতে বাঙ্গালীর দান, গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৯

১১। রায় রামমোহন ১৮১৮/১৯ সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ।

১২। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র, ১৮৪৭, বেতাল পঞ্চবিংশতি চতুর্থ উপাখ্যান।

১৩। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ, ১৮৯৩, জ্ঞান ও কর্মের উন্নতি।

১৪। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম প্রবন্ধটি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'মানসী ও মর্মবানী' ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যা।

১৫। 'মাসিক' পত্রিকার ভূমিকা, সম্পাদক, রাধানাথ সিকদার।

১৬। সেন সুকুমার, ১৯৯৮, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৬৩

১৭। মিত্র প্যারীচাঁদ (১৮৫৮) আলালের ঘরের দুলাল।

১৮। বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠখণ্ড, ২য় সংখ্যা ১২৮৫

১৯। অংশটি হুতোম প্যাঁচার নক্সা-র দ্বিতীয় ভাগের (১৮৬২) বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২০। 'ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় হুতোমের নক্শার জবাব হিসাবে হুতোমকে কটাক্ষ করে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' লিখেছেন।...'গ্রন্থের ভাষারীতি বিষয়ে হুতোমের প্রদর্শিত পথে না গিয়ে লেখক প্যারীচাঁদের সাধুচলিত মিশ্রিত আলালী রীতিকেই বেশি পছন্দ করেছেন।' খান মনিলাল, ২০০১ বাংলা চলিত গদ্য, কলকাতা, সোনারতরী, পৃ. ৭২-৭৩।

২১। 'সমাজ কুচিত্র' সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা বই। অনুষ্ঠান শীর্ষক অংশ ও কিছু কিছু পাদটীকা ছাড়া সমুদয় কলিকাতার কথ্য ভাষায় লেখা। তথ্য—খান, মনিলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।

২২। হরিদাসের গুপ্ত কথা সম্পর্কে মনিলাল খান বলেন "উপন্যাসটির আকর্ষণ এর ভাষারীতি। লেখক সহজভাবে স্বাভাবিক চলিতগদ্য ব্যবহার করে দেখিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে এই ধরনের আখ্যানমূলক গদ্যগ্রন্থে দেখা যায় নি। ভাষায় পুরোপুরি কোলকাতা অঞ্চলের মুখের ছাপ।' সূত্র : খান মনিলাল, বাংলা চলিত গদ্য, সোনার তরী, কলকাতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

২৩। দাশ নির্মল, ২০০১, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৩৮

২৪। দাশ নির্মল, ২০০১, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত পৃ. ২৩৯।

১.৩ রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষা চিন্তা

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন সেই সময়টি ছিল সাধুভাষার যুগ। সেই যুগে যাবতীয় লেখা হত সাধুভাষায়। সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে সাধুভাষা থেকে চলিত রীতিতে সাহিত্য রচিত হোক এই অভিপ্রায় অনেকের মধ্যেই ছিল, এই তাগিদ কেউ কেউ অন্তরে অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধে ও সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা, সাহিত্যে পাওয়া যায় সেই ভাষা ব্যবহারের নমুনা।

বাংলা গদ্যের চলিতরূপে চূড়ান্তরূপের পরিণাম দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যে বিশেষত তাঁর শেষ ত্রিশ বৎসরের গদ্য রচনায়। সাধু ও চলিত ভাষার প্রভেদকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে বুঝিয়েছেন তার 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে—

"রূপকথায় বলে এক-যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানী সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলা বাক্যাধাপের আছে দুই রানী একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা, আর একটাকে কথ্যভাষা, কেউ বলে চলতিভাষা, আমার কোন কোন লেখায় বলেছি প্রাকৃত বাঙ্‌লা। সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলা। চল্‌তি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটায় সুতো দিয়ে বোনা...গল্পের শেষ অংশটা এখনও সম্পূর্ণ আসেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবে রাজাসনে।"[১] চলিত গদ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা অমুলক ছিলেন না। আজ সাধু ভাষা নয় আধুনিক চলিত গদ্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সত্যই রাজাসনে বসেছে। বাংলা চলিত রীতি অপামর জনসাধারণের দৈনন্দিন লেখার মধ্যমে হয়ে উঠেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত গোষ্ঠীর প্রভাবে বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃত প্রভাব পড়েছিল তা কাটিয়ে উঠতে বাংলা গদ্যের অনেক সময় লেগেছিল।—"বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশির ফরমাসে এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আসন দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়ে ঘাতকতার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।'[২]

তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে, চলিত গদ্যের ব্যাপক ব্যবহার করেন 'সবুজপত্রে'র যুগে। তার আগে 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে (প্রকাশ ১৯০০ খ্রীঃ) প্রথম প্রাকৃত (চলিত বাংলা) বাংলার ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন। তিনি মন্তব্য করেন "দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাটু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্যভাবের বাহন নয় ; ইহার গতিশক্তি ও বাহনাক্তি কৃত্রিম ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।"[৩]

গদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটা দ্বিধা ছিল। তিনি নিজেই সে প্রশ্নের সমাধান করে

দিয়েছেন।—"আমি যে কথাটা বলেছিলাম সে এই যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার সামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম অনুসারে এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলই সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভের অনেক দিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্য দশায় আসিয়াছে। আমাদের ভাষার অসামঞ্জস্য প্রবল। সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতর আয়োজন চলিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আইন কর্তার পাদুর্ভাব হইল। তারা বলিলেন লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছাইছে, ইহার বেশি আর তাহার নড়িবার হুকুম নাই।[৪]

'সবুজপত্রে'র আবির্ভাব সে জায়গায় নাড়া দিয়ে গেল। 'সবুজপত্রের' সম্পাদকের সঙ্গে তিনি একমত পুথির প্রাণ কাঁদছে কথার ভাষার সঙ্গে মালাবদল করার জন্য। ঠিক হল কোলকাতার মানুষের মুখের ভাষা মার্জিত হয়ে সাহিত্যে চলিত রীতিতে প্রতিষ্ঠিত হল। কোলকাতা অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার শিষ্ট রূপই হল মানুষের সাহিত্যের ভাষা। এই প্রসঙ্গে 'মন্ত্রী অভিষেক' প্রবন্ধ ও ১৯৪১ সালে মৃত্যুর আগে প্রকাশিত 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধ দু'টি স্মরণ করা যেতে পারে। এতকালে রবীন্দ্রপ্রবন্ধ শুধু সাধুগদ্যের খাতেই প্রবাহিত হত। শেষের দিকে চলিত গদ্যকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচিত হয়েছে। যেমনটি ঘটেছিল 'ঘরে বাইরে'র পরের উপন্যাসগুলিতে বা 'তিনসঙ্গী'র পরের ছোটগল্পগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথ একজন ভাষাতাত্ত্বিকের মতো নিপুণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি নিয়ে বাংলা গদ্যের ক্রমটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। বাংলা গদ্যের তিনটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন—প্রাচীন সংস্কৃত সাধুভাষাশ্রয়ী সাধুগদ্য তার মধ্যে কথ্যরীতির সংঘাত। এই সংঘাতের ফলে বাংলা গদ্যের আকার বিবর্তিত হল। এই বিবর্তনের মধ্যে কথ্য বাংলার রূপ ধীরে ধীরে সাহিত্যে প্রবেশ করল। বাংলা সাধু ও চলিত গদ্যের ব্যবধান ক্রমশ কমে আসতে লাগল—"গত পঞ্চাশ ষাট বছরে সমাজ জীবনের দিগন্ত প্রসারের ফলে এখন কথা ও লেখার সীমানার ভেদ থাকছে না। সাহিত্যিক দন্ড ধারা থেকে গুরুচণ্ডালী অপরাধের কোটা উঠেই গেছে। নোতুন কালে, নোতুন জীবন বাংলা ভাষাকে দিয়েছে নবপ্রাণ, নবসম্পদ। নোতুন জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে রীতির সঙ্গে আমাদের যত পরিচয় বেড়ে চলেছে, আমাদের ভাষার প্রকাশ ততই হচ্ছে ব্যাপক।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্যভাবনার পরিচয় আমরা পেয়েছি ১৮৮১ সালে "য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্রে"। পরে ১৮৯১ সালে "য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯) গ্রন্থে চলিত ভাষা নিয়ে চিন্তার প্রকাশ রয়েছে। এছাড়া 'গোরা' (১৯১০)র সংলাপ ও ছিন্নপত্রাবলীর (১৯১২ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) ভাষা—চলিত ভাষা। 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৪ সালে। কাজেই 'সবুজপত্রে'র আগেই রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষা চর্চার পরিচয় রয়েছে। 'সবুজপত্র' এসে রাতারাতি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরীতিকে বদলে দিয়ে গেল এ যুক্তি, তথ্য ও প্রামানিকতার দিক থেকে ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্যরীতির প্রয়াসে 'সবুজপত্র' একটি কারণ অবশ্যই কিন্তু একমাত্র কারন নয়। 'সবুজপত্রের' ভূমিকা ঐতিহাসিক। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরো কথা বলা হয়েছে।

গ্রন্থসূত্র

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮), রবীন্দ্র রচনাবলী, (দশম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা ভাষা পরিচয়, কলকাতা, পূর্বোক্ত।

৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা ভাষা পরিচয়, কলকাতা, পূর্বোক্ত।

৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, (দশম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৬০৪

৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা পরিচয়, পূর্বোক্ত।

১.৪ 'সবুজপত্র' ও রবীন্দ্রউপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্যের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না 'সবুজপত্র' পত্রিকার আলোচনা ছাড়া। এই একটি মাত্র পত্রিকা যা রবীন্দ্র সাহিত্য বিশেষতঃ রবীন্দ্রগদ্যের দিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। 'সবুজপত্র' আবির্ভাবের একটা ইতিহাস আছে। 'সবুজপত্র'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের সম্পর্ক কেমন ছিল তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন—

'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় ২৫শে বৈশাখ (১৩২১ সাল) রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে। অর্থাৎ ইংরাজীর ১৯১৪ সাল। এই সময়ের আগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মনোজগত কেমন ছিল তাও জানা দরকার। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার (১৯১৩) অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্র বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করে। সমকালীন বাঙালী বিদ্বৎজন রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে কথা বলেন নি। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর কটাক্ষ অনেক আগে থেকেই ছিল। তাঁর প্রথম রচনা 'করুণা', পরবর্তীকালে 'চোখের বালি', সবই সমালোচিত হয়েছিল। তবে এই সব সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের মনোজগতকে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছিল "আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ" (দ্বিতীয় খন্ড)-এ নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখছেন—"বাঙালীর এই অনাদর তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্যের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিল অথচ তাঁহার মন হইতে অনাদরের ক্ষোভ কখনই ঘুচাইতে পারে নাই, তাই তিনি জীবনের শেষের দিকে অভিমান করিয়া লিখিলেন,—

"যেটা যথার্থ ক্ষোভের বিষয় সেটা এই যে, আমার দেশে আমার নিন্দার ব্যবসায় জীবিকা ভালো চলে, বুঝতে পারি আমার সম্বন্ধে তীব্রবিদ্বেষ কতদূর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আমার দেশের লোককে কতই কম বেদনা দেয়। তা যদি না হোত তাহলে আমার বিরুদ্ধে নিন্দার পণ্য এত লাভজনক হত না।'[১]

তিনি বৃদ্ধ বয়সে বাঙালীর নিন্দা ও উপেক্ষা সম্বন্ধে এই দুর্বলতা কেন দেখালেন তা বোঝা কঠিন।

২৩শে নভেম্বর ১৯১৩ সালে জগদীশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে একটি স্পেশাল ট্রেনে কোলকাতার সাহিত্যিকরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাতে। সেই দলে অনেক রবীন্দ্র ভক্ত ছিলেন। অনেক রবীন্দ্র নিন্দুকও ছিলেন। এই সম্বর্ধনা রবীন্দ্রনাথের কাছে সুখকর ছিল না। যার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী ঘটনাবলীতে। এরপর কোলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রতিক্রিয়া ভালো হয়নি। তিনি একটি গান লিখলেন—"এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।"—এই গানটি রবীন্দ্র বিরোধীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা বন্ধ করে দেবার সংকল্প করেন। তিনি এ অভিপ্রায় জানান রবীন্দ্র অনুরাগী মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে।—

আমার মনে হয়েছে, কোন লেখা প্রকাশ করতে সিকি পয়সার উৎসাহ বোধ হয় না।...যে সব জিনিসের প্রতি দরদ আছে সজারুদের সভায় তাদের বর্ষণ করতে আর কতদিন আর উৎসাহ থাকে বল? ওদের পিঠের কাঁটা এখনও পর্যন্ত নামল না—থাক তোরা ঐ আকাশের ঝাঁটা উঁচিয়ে।"[২]

'সবুজপত্র' প্রকাশের কাহিনি প্রমথ চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন।—"আমি আর মনিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাই দহে পদ্মা নদীর উপর তাঁর বোটে একবার কিছুদিন থাকতে যাই। এই বোটে মনিলালের কাছে শুনি যে রবীন্দ্রনাথ আর লিখবেন না। তিনি ঢের লিখেছেন। তিনি বলেন 'প্রমথ যদি একটা কাগজ বের করে তাহলে আমি তাতে লিখতে রাজী আছি'। আমি বল্লুম আপনি যদি লেখেন তো আমি কাগজ বের করতে রাজী আছি। তিনি বলেন 'অন্য কোন কাগজে আমি লিখব না।'

মনিলালের একটা কাগজ ছিল। কথা ঠিক হয় যে সেই কাগজই 'সবুজপত্র' নামে ছাপা হবে। এই নতুন নাম আমিই দিয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ১৩২১ সালের বৈশাখে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়।"[৩]

মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কতটা উৎসাহী ছিলেন তা সমকালীন পত্রাবলীতে সেই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"সেই কাগজটার কথা চিন্তা করো...সবুজপত্র উদ্‌গমনের সময় হয়েছে—বসন্তের হাওয়ায় সে কথা চাপা রইল না—অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই।"[৪]

"বিশিষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন করে একটি মাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে মনিলাল আমার কাছে এসেছিল। আমি জানতুম এটা খুব কঠিন কাজ—আমার অন্য কর্তব্যের উপর এটা চাপানো বোঝা দুঃসহ ভারী হবে তাই নিজে এ দায় নিতে রাজী হলুম না অথচ অত্যন্ত প্রয়োজন আছে একথা অনেকদিন ভেবেছি। তাই সংকল্পটিকে একেবারে নামঞ্জুর করতে পারলুম না। নৌকা ভাসাবার জন্য প্রথম ধাক্কা দিতে এবং কিছুদিনের জন্য লগি ঠেলতে রাজি হলুম...প্রমথকে সম্পাদক করতে পরামর্শ দিয়েছিলুম।"[৫]

প্রমথ চৌধুরী মত একটি বিশিষ্ট বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

'সবুজপত্র' ভাষা ও ভাবের ক্ষেত্রে যে আন্দোলনের সূচনা করে তার প্রেরণার উৎস ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সনাতন পন্থীদের প্রতিরোধের প্রতিকূলতার উজান ঠেলে অগ্রসর হবার উৎসাহ তাঁর কাছ থেকে না পেলে 'সবুজপত্র'কে নবযুগের মুখপত্রে প্রতিষ্ঠা দান করা সম্ভব ছিল না। 'সবুজপত্র' প্রকাশের প্রথম দু-বছর (১৩২১-২৩) মাত্র দুজন লেখক প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের পরামর্শেই একটি লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠে 'সবুজপত্র'কে ঘিরে। এদের মধ্যে ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বরদাচরণ গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী বীরেশ্বর মজুমদার, সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য, ইন্দিরা দেবী চৌধুরী প্রমুখ। 'সবুজপত্র'কে অবলম্বনকারেই প্রমথ চৌধুরী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কান্ডারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন রবীন্দ্রনাথের এই কামনা ছিল প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—

"তোমাকে আমি একটি নবীন লেখক মণ্ডলীর কেন্দ্রে অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত দেখতে ইচ্ছা করি। এইজন্য সবুজপত্রের প্রতি আমার যা কিছু ঔৎসুক্য আর দেহমনের বিমুখতা সত্ত্বেও

যতটুকু পারি লিখচি। কিন্তু তোমার জায়গাটা তুমি সম্পূর্ণ জুড়ে বস।"...এখন তোমার কক্ষে আমার জ্যোতিষ্কটাকে চালিয়ে দাও বাংলাদেশের বর্তমান যুগকে সে তার আলোক দেখিয়ে আসুক।"[৬]

তবে মাঝে মাঝে 'সবুজপত্রে'র অস্তিত্বের সঙ্কট উপস্থিত হত। ১৩২৩ সালের শেষের দিকে 'সবুজপত্র' প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। নানা কারণে প্রমথ চৌধুরী ১৩২৫ সালেই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিতে মনস্থ করেন। ১৩৩২-৩৩ সালে 'সবুজপত্র' শেষবারের মত প্রকাশ পায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতা এবার নানা কারণে অনেকটা হ্রাস পায়। আর্থিক দু-র্ভাবনায় বিড়ম্বিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাগুলি অন্যত্র প্রকাশ করেছেন। 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে রবীন্দ্রনাথের মন থেকে যায় ছিল না।

একাধিক চিঠিতে তার প্রমান মেলে। "রচনার রাস্তায় তোমাদের সঙ্গে আমার যোগ বিচ্ছিন্ন করতে ভালো লাগে না—কেননা তোমাদের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আত্মীয়তা আছে।"[৭]

'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র সাহিত্যের দিক পরিবর্তন ঘটেছে একথা অনেকবার বলা হয়েছে। "ঘরে বাইরে" উপন্যাস থেকে যে চলিত গদ্যে উপন্যাস রচনার ধারা রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন তা বজায় রেখেছিলেন আমৃত্যু। কবিতার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছিল—ভাষাগত ও বিষয়গত শুধু "সবুজের আহ্বান" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে 'আধমরাদের ঘা দিতে চেয়েছিলেন" সেই আঘাত এসে লেগেছিল তার রচনার মর্মমূলে। 'সবুজপত্রে'র অভিঘাতে বদলে গেল তার ছোটগল্পের চরিত্র—'পয়লা নম্বর' গল্প থেকে তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন চলিত গদ্যে। সেইজন্য গল্পের নাম দিলেন 'পয়লা নম্বর।' প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লেগেছিল তার নাটকে। রবীন্দ্রনাথের নাট্য সংলাপে লেগেছিল চলিত গদ্যরীতির স্পর্শ। 'সবুজপত্র' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র সাহিত্য ভিন্ন খাতে বইতে লাগল তার অনেক কৃতিত্ব মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথচৌধুরীর প্রাপ্য। চলিত ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করেন নি তা নয় সেই চিন্তাকে তিনি বাস্তবে রূপদিতে দ্বিধাগ্রস্তছিলেন। 'সবুজপত্র' সেই জায়গায় সঠিক ধাক্কাটি দিতে পেরেছিল আর অন্তরের তাগিদ ও বাহিরের ধাক্কা দুয়ে মিলে রবীন্দ্র সাহিত্যের ভিন্ন স্বাদ উপস্থিত হল। এই গদ্যভাষা পরিবর্তনের জন্য রবীন্দ্রনাথ কম সমালোচিত হননি। ১.৫ অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহিত্য রসিকগণ 'সবুজপত্র' যুগের রচনাগুলির বিশেষত্ব। অনুভব করেছেন। 'ঘরে বাইরে' চতুরঙ্গ বিষয়ও বিন্যাসে তার পূর্ববর্তী উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র। 'ঘরে বাইরে'র জীবন সমস্যা ও আঙ্গিক পূর্ববর্তী উপন্যাসে এমন সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয়নি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে প্রকাশকালে এর জীবন বিন্যাসগত ব্যাপারে সনাতনপন্থী বিরূপতা প্রকট হয়ে ওঠে। ছোটগল্পের প্রকৃতিগত পার্থক্য ঘটল 'সবুজপত্রে' 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লানম্বর', 'হৈমন্তী' 'বোষ্টমী', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি' 'অপরিচিতা', 'পাত্রপাত্রী' ইত্যাদি। গল্পগুলির উপস্থাপনা অনেকটা তীর্যক। 'স্ত্রীরপত্রে' সহানুভূতি নয় নারীর স্বাধিকার বোধের দীপ্তি ও বৈচিত্র্য আমাদের সচকিত করে। সমকালীন পত্রপত্রিকাগুলি একেই ইবসেনের প্রভাব বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এতে ইউরোপের নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে এই সমস্ত গল্প উপন্যাসগুলি 'সবুজপত্রে'র বিদ্রোহচেতনার প্রভাব বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে 'সবুজপত্র'-এর ঋণ স্বীকার করেছেন—"আমি যখন সাময়িক পত্র লেখায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ প্রমথর আহ্বানমাত্র 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রিকাকে একটা বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন। তাতে—আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনার একটি নতুন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীয় মধ্যে তা সম্ভব হতে পারে না। 'সবুজপত্রে' সাহিত্যের এই একটি নতুন ভূমিকা রচনার কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হয়নি।"[৮] রবীন্দ্র চলিত গদ্যচর্চায় 'সবুজপত্র'-এর ভূমিকা তাই ঐতিহাসিক।

গ্রন্থসূত্র

১। চৌধুরী নীরদচন্দ্র, ১৪০২, আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৭।

২। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড—সূত্র : সরকার অশোককুমার, ১৯৯৪, সবুজপত্র ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, পুস্তকবিপণি, পৃ. ৫।

৩। রবীন্দ্রস্মৃতি, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৯৯৭ শক, (শ্রাবণ-আশ্বিন), সূত্র—সরকার অশোক কুমার, পূর্বোক্ত।

৪। চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪-৫

৫। রবীন্দ্রনাথের পত্র, পরিচয় কার্তিক ১৩৩৮।

৬। চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১।

৭। চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮।

৮। তদেব।

১.৫ চলিতভাষা বিতর্ক : রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ে সমকালীন সাহিত্য সমালোচকেরা বিরূপ ছিলেন। 'সবুজপত্র'-এর আবির্ভাব সনাতন পন্থীদের মধ্যে প্রবল পতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। 'সবুজপত্র'-এর ভাষারীতি ও অভিনবত্ব নিয়ে সমকালীন পত্র পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য করা হয়। এই পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে অগ্রণী 'সাহিত্য', 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', 'মানসী', 'মানসী' ও 'মর্ম্মবানী', নারায়ণ প্রভৃতি। একে একে এই বিষয়গুলি তুলে ধরা হল। শুধু তাই নয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস বের করে দেওয়া হয়।

সাহিত্য ঃ

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'সবুজপত্র'-এর সমালোচনা করতেন। তবে তার সমালোচনা, সবসময় বিরোধী ছিল এমন কথা বলা যায় না। 'সাহিত্য' এর ২৫ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দ্রের "সবুজ সাহিত্য" প্রবন্ধটি এ প্রসঙ্গে স্মরনীয়। রমাপ্রসাদ চন্দ্র লিখেছেন—"সবুজপত্র নামক নব মাসিক পত্র রবীন্দ্রনাথের দেশাচর্যরুপ জীবনব্যাপী যজ্ঞের একটি অভিনব অঙ্গ। এই যজ্ঞের হোতা ও উদগাতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অর্ধ্ব্যায়ু বা সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ওরফে বীরবল।...রবীন্দ্রনাথ 'সবুজের অভিযান' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এবং 'আমরা চলি সমুখ পানে' এই সামগান করিয়া এক নতুন ভাববন্যার সূচনা করিয়াছেন। এই বন্যার তাড়নায় কল্যাণকামী গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইবে।"[১]

আবার অন্য প্রসঙ্গে 'সবুজপত্র'-এর সমালোচনা করতেন। 'চলতি ভাষার সম্পর্কে' "সবুজপত্র"-এর বক্তব্য দুর্বোধ্য ও আজগুবি মনে হয়েছে। "পোষাকী ও আটপৌরে ভাষা চিরকাল আমাদের মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু শত চেষ্টা করিলেও বাঙ্গালা—লেখকের পক্ষে এই সাধুভাষা হাত ছাড়া করবার উপায় নেই।...প্রবল পরাক্রান্ত শব্দশিল্পীকেও চলিত ভাষায় লিখিতে হইলে চেষ্টা করিয়া কষ্ট করিয়া সাধু ভাষা হইতে চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লিখিতে হয়।"[২]

অন্যত্র রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসকে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মন্তব্য করেছেন।[৩]

আর্য্যাবর্ত্ত ঃ

'সবুজপত্র'-এর নতুন গদ্যরীতিকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' সমর্থন করেনি। চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মেলনে অক্ষয় চন্দ্র সরকারের মতামত উদ্ধৃত করে 'সবুজপত্র'-এর চলতি গদ্যরীতির বিপক্ষে ব্যবহার করেছেন 'আর্য্যাবর্ত্ত'। "মাতৃভাষাকে সেবা করিতে হইলে চিনিতে হয়। অনেক সময় মাতৃভাষাকে না চিনিয়া বিড়ম্বিত হই ; মাতৃভাষাকে আঘাত করি। এই অত্যাচার ও আঘাত 'সবুজপত্র'-এ যেরূপ প্রবল আর কোথাও তেমন প্রবল কিনা সন্দেহ।" তাছাড়া ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উদ্ধার করা হয়েছে—"কলকাতার কক্‌নি যদি বাঙ্গলা ভাষা হয়, কর্ণফুলী ও মেঘনার—মাঝিদের কথাও বাঙ্গলা বটে।"[৪]

চলিত গদ্যরীতির গৌন ত্রুটিগুলি উল্লেখ করলেও চল্‌তি ভাষার রীতির মর্মগত সত্যটি আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে। চলিত গদ্যরীতির তৎসম শব্দের নির্বাচনটি অসঙ্গত বলে মনে করে আর্য্যাবর্ত্ত।

"হচ্চি' ও 'হচ্ছি' কোনটি ব্যবহার করিবেন তাহা (প্রথম চৌধুরী) স্থির করিতে পারেন নাই।—তাঁহার সহকারী ঢাকের বাঁয়া ও সানাই এর পোঁ রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। দুইজনের ভাষা প্রয়োগে গঙ্গাযমুনার মত একই পত্রে (পাত্রে?) ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিরাজিত।" একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের গদ্যের প্রকৃতি চলতি হলেও তার কাঠামো ছিল সাধুভাষার। 'আর্য্যাবর্ত্ত নিছক তর্কের খাতিরেই এই পার্থক্যটুকু বড় করে দেখেছে।

১৩২১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিপরীত একটি গল্প বেরিয়েছিল "প্রকৃত স্ত্রীর পত্র" নামে। এই গল্পটি সম্ভবত সম্পাদকের রচনা বলেই অনুমান করা যায়। চিঠির বিষয়টি খুব কৌতুহলজনক—

—"তোমার পত্র পাইলাম এবং সেই সঙ্গে 'সবুজপত্র' নামে একখানি 'মাসিক পত্র' পাইলাম। 'সবুজপত্রে'র কভার ভিন্ন সব পাতাগুলিইতো সাদা। তবে ইহার নাম 'সবুজপত্র' কেন বুঝিলাম না।" 'সবুজপত্র'-এর চলিত ভাষাকেও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে টেনে আনা হয়েছে।—এতকাল জন্মভূমি পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া ছাড়িয়া কলিকাতায় বাস করিতেছি কখনও 'গেলুম' খেলুম বলি না তোমরা জান। পূর্ববঙ্গের নরনারী—কথ্যভাষাকে ও লেখ্যভাষাকে এক করিতে নারাজ। কলিকাতায় কথ্যভাষায় ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তক লিখাতে আমাদের মত একটা প্রকাণ্ড দেশ হাত ছাড়া হইয়া গেল।"[৬]

'নারায়ণ'

বাংলা গদ্যরীতির প্রকাশে 'সবুজপত্র'-এর বিশিষ্টতাকে 'নারায়ণ' পত্রিকা স্বীকার করতে চায়নি। চলিত রীতির এই চর্চাকে তাদের উৎকেন্দ্রিকতা বলে মনে হয়েছিল। চলিত গদ্যরীতির সম্ভাবনা বিষয়ে 'নারায়ণ' সচেতন হতে আগ্রহী হয়নি। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির বিপরীতে অনেকগুলি গল্প লেখা হয়েছে যেমন বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা' এবং গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরীর রচিত 'দোসরানম্বর' (১৩২৪ শ্রাবণ) গল্প যতীন্দ্রমোহন সিংহ রচিত "একটি মামলার রায়' (১৩২৪ আষাঢ়) প্রভৃতি। এই সমস্ত গল্পে রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়বস্তুত ভাষারীতিকে আক্রমণ করা হয়েছে। 'মৃণালের কথা' 'দোসরা নম্বর' গল্প করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' 'পয়লা নম্বর' গল্প থেকে 'একটি মকদ্দমার রায় (১৩২৪ আষাঢ়)' কিছুটা চমকপ্রদ। আইন আদালতের প্রতিবেদনের মত চলতি ও সাধু ভাষার 'মামলার রিপোর্ট' এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"

'মানসী ও মর্ম্মবানী' 'সবুজপত্র' বিরোধীতায় তেমনভাবে উৎসাহী না হলেও 'সবুজপত্র'-এর গদ্যরীতিকে পত্রিকাগুলি সমর্থন করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক ভাবনা কিংবা 'সবুজপত্র'-এর চলতি রীতির গদ্যকে মানসী সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি। প্রমথ চৌধুরীর উপরে মাঝে মাঝেই কটাক্ষপাত করা হয়েছে—"সবুজপত্রে' নতুনত্ব আছে—লেখক একা রবীন্দ্রনাথ। সম্পাদক মুখপত্রে নাম বিশেষ হইয়া আছেন। সেদিন একজন বন্ধু বলিতেছিলেন, এমন সম্পাদক আমিও

হইতে পারি কিন্তু মুখপত্রে নামটি ছাপিতে রাজি নই।"[৭]

"তবে মানসীর চলিত গদ্য সম্পর্কে মনোভাব যে প্রতিকুল ছিল

[প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মর্মবাণীপত্রিকা ১৩২২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা থেকে মানসীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'মানসী মর্ম্মবানী' রূপে পরিচিত হয়।]

রাণাঘাট বার্তাবহ ঃ

এই পত্রিকাটি 'সবুজপত্র' বিরোধীতায় যুক্ত ছিল। 'সাহিত্যে কালাপাহাড়' ও 'সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারও তার সভাপতি প্রমথ চৌধুরী দু'টি প্রবন্ধে গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও তার ভাষাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়।

"সবুজ ও কাঁচা দলের উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমেই অসহ্য ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।...এই দলের অগ্রণী রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ তিনিই সবুজতন্ত্রের পুরোহিত। তাঁহার সবুজতন্ত্রের হিন্দুর সমাজ ধর্ম্মের উপরে ইদানীং যেভাবে আক্রমণ চলিতেছে তাহা বাঙ্গালার পাঠকদলের অগোচরে নাই।...জীব বিশেষের কণ্ঠে মুক্তার মালার যে অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় মাতৃভাষার অবস্থা তোমাদের হাতে পড়িয়া তাহা অপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইয়াছে।...আধুনিক সবুজতন্ত্রের কি গদ্য কি পদ্য শব্দার্থ জানা থাকিলেও তাহাদের ভাববোধ অসাধ্য কারণ সেগুলিতে যে কেবল গন্ধ।"[৮]

উপাসনা ঃ

'উপাসনা' পত্রিকাতে ভাষারীতির সমালোচনা করা হয়—"যখন জাতি নব্য উদ্বুদ্ধ চেতনার দ্বারা বিশ্বকে আলোড়িত করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য ব্যস্ত তখন রবীন্দ্রনাথ তাহাকে মিথ্যা একটা বস্তুতন্ত্রহীন বিশ্বজনীনতার প্রলোভন দেখাইতেছেন।"[৯]

সমকালীন সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ক্ষোভের কথা কখনও কারো কাছে প্রকাশও করেছেন কিন্তু বাঙালী জাতীর প্রতি তাঁর প্রীতি কম ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখছেন—

"বাঙালীর এই অনাদর তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্যের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিল। অথচ তাঁহার মন হইতে অনাদরের ক্ষোভ কখনই ঘুচাইতে পারে নাই। তাই তিনি জীবনের শেষের দিকে অভিমান করিয়া লিখিলেন—

"যেটা যথার্থ ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমার দেশে আমার নিন্দার ব্যবসায়ে জীবিকা ভালো চলে, বুঝতে পারি আমার সম্বন্ধে তীব্রবিদ্বেষ কতদূর পরিব্যপ্ত হয়ে আছে আমার দেশে। আমার প্রতি আঘাত, আমাকে অবমাননা দেশের লোককে কমই বেদনা দেয়। তা যদি না হোত তা হলে আমার বিরুদ্ধে নিন্দার পণ্য এত লাভজনক হত না।"[১০]

সমকালীন সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করলেন, তাঁর সাহিত্যরীতি, গদ্যচর্চার ধারাকে আক্রমণ করলেন। তাদের আক্রমণ কখনও ব্যক্তিগত পর্যায়ে গিয়ে পড়ল কখনও বা তাদের আক্রমণের ভাষা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করল। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে 'ঘরে

বাইরে' উপন্যাস বের করে দেওয়া হয়। এমন কি আচার্য ব্রজেন্দ্রশীল পর্যন্ত একে বরদাস্ত করতে পারেন নি। সমস্ত সমালোচনাই রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করতে হয়েছিল। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', পত্রিকায় রবীন্দ্রগদ্যের ঐতিহ্য স্মরণ থাকলেও তখন অন্য এক বিতর্ক এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু ইতিহাস কি বলে? রক্ষণশীলরা কি সাধুগদ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন? কালের নিয়োমে সাধু গদ্য প্রায় হারিয়ে গেল, রক্ষণশীলরাও হারিয়ে গেলেন। কিন্তু কালজয়ী হয়ে বাঙালীর মনে বেঁচে রইলেন রবীন্দ্রনাথ—যা আজও বহুপঠিত, বহুচর্চিত।

গ্রন্থসূত্র

১–৯। সরকার অশোক কুমার, ১৯৯৪, সবুজপত্র ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, পুস্তকবিপণি পৃ. ৪৯-৬১।

১০। চৌধুরী নীরদচন্দ্র, ১৪০২, আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

১১। সরকার অশোক কুমার, ১৯৯৪, 'সবুজপত্র ও বাংলা সাহিত্য', কলকাতা,পুস্তক বিপণি।